প্রত্নচিহ্ন -র পরবর্তী সংখ্যার জন্য লেখা পাঠান। লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ ১৫ই আগস্ট, ২০২০। লেখা পাঠানোর জন্য যোগাযোগ করুন 8942924234 এই নম্বরে।
E-mail : ab.farque@gmail.com

ইতিহাস খুঁড়ে ইতিহাস উদ্ধার

PDF MAGAZINE

ব্যক্তিগত বিতরণের জন্য

দ্বিমাসিক ৪ পাতা   ১ম বর্ষ - ২ সংখ্যা ❑ ২০ শ্রাবণ, বুধবার, ১৪২৭ সন ❑ ৫ আগস্ট, ২০২০

বাংলা-বাঙালি-বাংলাদেশ একটি পর্যালোচনা

ড. রাজর্ষি চক্রবর্ত্তী, ইতিহাস বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা ধীরে ধীরে দিল্লী সুলতানীর অংশ হয়ে যায়। তবে বাংলার শাসকরা মাঝে মাঝেই দিল্লীর সুলতানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতেন ও স্বাধীন হয়ে যেতেন। দিল্লীর সুলতান ইলতুৎমিস, বলবন, ফিরোজ শাহ্ তুঘলক প্রত্যেকেই বাংলার বিদ্রোহ দমনের জন্য অভিযান প্রেরণ করতে হয়েছিল। শেষে ১৩৪২ খ্রীস্টাব্দে শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ্ সমগ্র বাংলাকে ঐক্যবদ্ধ করে স্বাধীন ইলিয়াস শাহি শাসনের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি 'শাহ-ই-বাঙালি' ছিলেন না, কিন্তু তিনি নিজেকে সমগ্র বাংলার শাহ হিসাবে ঘোষণা করেন।

এরপর বাঙালির ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ১৪৮৬ খ্রীস্টাব্দে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব। চৈতন্যদেবের পরিবারের আদিনিবাস উত্তর-পূর্ব বাংলার শ্রীহট্ট বা সিলেট। তাঁর পিতা নবদ্বীপে চলে আসেন ও এখানেই শ্রীচৈতন্যের জন্ম। তিনি তার জাদুকাঠির স্পর্শে সমগ্র বাংলায় রূপান্তর ঘটালেন। সারা বাংলা ভাসল তাঁর প্রেম-ভক্তির আবেগে। এককভাবে আর কোন বাঙালি সমগ্র বাঙলায় এতবড় বিপ্লব এনেছেন বলে মনে হয়না। তাঁর প্রভাব অবশ্য শুধু বাংলাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তৎকালীন বাংলার শাসক হুসেন শাহ ও শ্রীচৈতন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। কবি লিখছেন —

'বাঙালির হিয়া অমিয় মথিয়া
নিমাই ধরেছে কায়া'।

ইলিয়াস শাহি ও হুসেন শাহি আমলে বাংলা ছিল স্বাধীন। এই সময় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করতে আরম্ভ করে। এই ভাষা-সংস্কৃতির উন্নতিতে চৈতন্যের প্রবর্তিত গৌড়িয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব অপরিসীম। এদিকে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই দিল্লীতে প্রতিষ্ঠিত হল মুঘল শাসন। এই শতাব্দীর দ্বিতীয়

দাউদ খান কররানি

ভাগে মঘুলরা বাংলার ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে অগ্রসর হল। সম্রাট আকবরের সৈন্য তুরকাইয়ের রণাঙ্গণে বাংলার শেষ স্বাধীন সুলতান দাউদ খান কররাণিকে পরাজিত করল ১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দে। কিন্তু মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালো বাংলার বারো ভুঁইয়ারা। আকবর তাঁর জীবনকালে সমগ্র বাংলা দখল করতে পারলেন না। তাঁর পুত্র জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে মুঘল সৈন্য ঢাকা অবধি অগ্রসর হতে পারল। ঢাকার নতুন নাম হল জাহাঙ্গীরনগর। তবে শেষ পর্যন্ত ঔরঙ্গজেবের সময় শায়েস্তা খান বাংলার সুবাদার হয়ে এলেন ও দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় মগ জলদস্যুদের পরাজিত করে ও পাঠান দলপতিদের হারিয়ে সমগ্র বাংলায় মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠা করলেন।

আমরা রাজপুতদের বীরত্বের কথা পড়ি - আকবরের সঙ্গে প্রতাপের যুদ্ধের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি, কিন্তু বাংলার শাসকরা যে মুঘল সৈন্যদের বিরুদ্ধে বাংলার শেষ স্বাধীন সুলতান দাউদ খান কররাণিকে পরাজিত করতে আকবর বাদশাহকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ১৫৭৬ খ্রীস্টাব্দে যদি বা অনেক কষ্টে রাজমহলের যুদ্ধে দাউদ খানকে পরাজিত করা গেল, বাদশাহ আকবরের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় বারো ভুঁইয়ারা।

এরপর ৩ পৃষ্ঠায় ▶

ত্রিপুরা - এক বর্ণময় ইতিহাসের হাতছানি

সুব্রত বিশ্বাস

কথা মতো জীবনদা স্টেশনেই আমাদের জন্য অপেক্ষারত ছিলেন সেখান থেকে গাড়ি করে মিনিট বিশেকের মধ্যেই আমরা পৌঁছে গেলাম আগরতলা শহরের কেন্দ্রে অবস্থিত সূর্য রোডে জীবনদার বাড়িতে। দেখলাম বাড়ির প্রতিটি সদস্য অতরাত্রেও আমাদের জন্য অপেক্ষামান। এরপর গলা ও রাতের খাবার পর্ব শেষ করে যে যার বিশ্রামে চলে গেলাম।

দীর্ঘ যাত্রার জন্য পরেরদিন অর্থাৎ ৩ তারিখ বেশী দূর ঘোরাঘুরি না করে স্থানীয় কিছু মন্দির ও রাজবাড়ি ঘুরে দেখব বলে স্থির করি। এর মধ্যে সবথেকে নজর কাড়ার মতো ছিল ত্রিপুরা রাজবাড়িটি, বর্তমানে এটি ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ দ্বারা সংরক্ষিত একটি সংগ্রহশালা। ইতিহাস ঘাটলে জানা যায়, ১৯০১ সালে তৎকালীন রাজা রাধা কিশোর মানিক্য এই প্রাসাদটি প্রায় ২০ একর জমির ওপর স্থাপন করেন। বর্তমানের এই সংগ্রহশালায় যেমন রয়েছে স্থানীয় সংস্কৃতির বর্ণময় কিরণ, তেমনি রয়েছে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন বই রবীন্দ্র গ্যালারিতে। এছাড়াও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ গ্যালারীতে রয়েছে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ থেকে আসা শরণার্থীদের বেশ কিছু দুর্লভ ছবি। যা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না। দুর্ভাগ্য ভেতরে চিত্র গ্রহণের অনুমতি না থাকা। এরপর বেরোনোর পথে ইতিহাস গৌরবময় দিনের প্রতীক, কামানটিকে পেছনে ফেলে ও দীঘিটিকে পাশে রেখে আমরা এগিয়ে চললাম স্থানীয় রাধামাধব মন্দিরের উদ্দেশ্যে। মন্দিরটির প্রধান বিশেষত্ব হল এর অসাধারণ গঠন শৈলী ও রাধামাধবের নিবেদনে বিশেষ সন্ধ্যা আরতী। এক লহমায় ভরে উঠলো মন, দূর হল সারাদিনের ক্লান্তি।

এরপর দিন, অর্থাৎ ৪ঠা জানুয়ারী আমরা স্থির করি যাব উদয়পুর মাতাবাড়ি মন্দির, রুদ্রসাগর তথা নীরমহল এবং ফিরতি পথে সিপাহীজালা ন্যাশানাল পার্ক। সেইমত সকাল ৭টায় আমরা বেড়িয়ে পড়লাম অভিষ্ট লক্ষ্যে।

আগরতলা থেকে উদয়পুর যাতাবাড়ি যেতে সময় লাগে প্রায় ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট। জানা যায় ১৫০১ সালে মহারাজা ধন্যমানিক্য এর হাত ধরে প্রতিষ্ঠিত হয় মন্দিরটি। ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির রূপেও পরিচিত এই মন্দিরটি। শাক্তদেবীর আরাধ্য স্থল হিসাবে মন্দিরটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল পশুবলি। আর এই পশুবলিই একদিন গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল রবীন্দ্রনাথকেও। তাঁর 'রাজারাণী' উপন্যাসে, মহাজারা গোবিন্দ মানিক্যর

এরপর ২ পৃষ্ঠায় ▶

সম্পাদকীয়

প্রত্নচিহ্ন ই ম্যাগাজিনের এটা দ্বিতীয় সংখ্যা। আশা করি প্রথম সংখ্যা আপনাদের আশা পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে। আমরা আরও যতদিন যাবো আপনাদের সামনে ইতিহাসের অনেক কম জানা তথ্য আপনাদের সামনে তুলে ধরব। জুলাই মাসের ১৪ তারিখ ইউরোপের ইতিহাসের এক যুগান্তকারী দিন। এই দিন ১৭৮৯ সালে ফ্রান্সের কুখ্যাত বাস্তিল দুর্গের পতন হয়। এটা ছিল ফ্রান্সের সাধারণ মানুষের বহুদিনের বঞ্চনার বহিঃপ্রকাশ। বাস্তিলে কোন বন্দী প্রবেশ করলে তার ওপর চলত নারকীয় অত্যাচার। ১৭৮৯ -এর ১৪ই জুলাই নির্বাচিত প্রতিনিধি, বাস্তিল দুর্গের আশপাশের মানুষ দুর্গের প্রধান দ্য লোনের কাছে প্রস্তাব রাখেন ৭ জন রাজবন্দীকে মুক্তি দেওয়ার। কিন্তু দ্য লোন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে বিক্ষুব্ধ জনতা দুর্গের ভিতর ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রায় ২০০ বিপ্লবী শহীদ হন। এরপর চারিদিক থেকে বিক্ষুব্ধ জনতা বাস্তিল দুর্গ ধ্বংস করে। এই ঘটনাটি ফরাসী বিপ্লবের পথকে সুগম করে। পরবর্তীকালে বুরবোঁ রজতন্ত্রের পতন হয়, জয় হয় সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার। বাস্তিলের পতন ছিল ফ্রান্সের স্বৈরাচারের পতনের প্রথম ধাপ।

আর কিছুদিন পরই ভারতের স্বাধীনতা দিবস। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ থেকে মুক্তির দিন ১৫ই আগস্ট। যা এসেছিল বহু গণ আন্দোলন ও তরুণ প্রাণের বিনিময়ে। যাঁদের অনেকের নাম আমরা মনেও রাখিনি। সেই সব মৃত্যুঞ্জয়ী বীরদের প্রণাম জানিয়ে আপনাদের প্রত্যেককে জানাই স্বাধীনতা দিবসের অগ্রিম শুভেচ্ছা।

▶ ১ পৃষ্ঠার পর

ত্রিপুরা - এক বর্ণময় ইতিহাসের হাতছানি

পালিত শিশু তাই বলে ওঠে — 'এত রক্ত কেন?' দেবী মন্দির সংলগ্ন বিশাল দীঘি সামগ্রিকভাবে স্থানটিকে প্রদান করেছে অপার্থিব সৌন্দর্য। ভাগ্য ভাল থাকলে দীঘিপাড়ে বিশ্রাম রত বড় বড় কচ্ছপও চোখে পড়ে যেতেই পারে।

যাইহোক, সেখানকার পূজাপর্ব সেরে আমরা বেড়িয়ে পড়লাম পরবর্তী গন্তব্য রুদ্রসাগরের উদ্দেশ্যে। পথমধ্যে দুপুরের খাবার গ্রহণের জন্য দাঁড়ালাম একটি ছোটখাট হোটেলে। তবে হোটেলটির খাদ্য পরিবেশনের রুচি ছিল অসাধারণ। বাঙালিয়ানার এক প্রকৃষ্ঠ উদাহরণ। এরপর সামান্য বিশ্রাম পর্ব সেরে পুনরায় বেড়িয়ে পড়লাম নীরমহলের লক্ষে ও মিনিট ৫০ এর মধ্যেই পৌঁছে গেলাম সেখানে।

এক অদ্ভুত মনোহরণ দৃশ্য ফুটে উঠলো চোখের সামনে। বিস্তীর্ণ জলরাশির মধ্যে দৃশ্যমান এক অপূর্ব প্রসাদ। ইতিহাস মতে ১৯৩০ সালে ত্রিপুরার রাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্যের আমলে তৈরী হয়েছিল প্রাসাদটি। প্রায় আট বছর ধরে নির্মাণ হওয়া এই প্রাসাদটির বরাত পেয়েছিল ইংরেজ কোম্পানী 'মার্টিন ও বার্ণস'। হিন্দু-ইসলাম ধর্মের মিশ্র স্থাপত্যের এক অভুত পূর্ব উদাহরণ এই প্রাসাদটি। সেখানে একটি ব্যক্তিগত নৌকা ভাড়া করে এবার আমরা এগিয়ে চললাম মহলটির উদ্দেশ্যে। মিনিট ১৫-এর মধ্যেই পৌঁছে গেলাম প্রাসাদের সন্নিকটে। মাঝির কাছে জানলাম বর্ষাকাল হলে নৌকা সোজা প্রাসাদের মধ্যবর্তী ঘাটে প্রবেশ করতে পারে।

মহলটির কারুকার্যের সূক্ষতা সত্যিই সেদিন আমাকে মন্ত্রমুগ্ধ করেছিল। মুসলিম স্থাপত্যের গোম্বুজ ও হিন্দু স্থাপত্যের কারুকার্যের সহাবস্থানে যে আমরা প্রত্যেকেই বিস্মিত হয়েছিলাম তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ২৪টি কক্ষ বিশিষ্ট এই মহলটি ছিল এক সময়ের রাজকীয় মর্যাদার প্রতীক। জানা যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও রাজ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে এখানে কাটিয়ে দিলেন বেশ কিছুটা সময়। মহলের ভেতর থেকে বিস্তীর্ণ জলরাশি সত্যই যেন 'নীরমহল' নামকরণের সার্থকতা বহন করে। হাতে সময় কম থাকায় ৩০ মিনিট মতো সেখানে কাটিয়ে, পুনরায় নৌকা যোগে ফিরে এলাম দীঘিপাড়ে।

আর দেরী না করে এবার আমাদের পরবর্তী গন্তব্য সিপাহীজলা অভয়ারাণ্য। রুদ্রসাগর থেকে সেখানে পৌঁছতে সময় লাগে প্রায় ১ ঘন্টা ২০ মিনিট মতো। প্রায় ১৮.৫৩ বর্গকিমি. স্থান ব্যাপী বিস্তৃত এই অভয়ারাণ্যটি। বেশ কিছু প্রজাতির প্রাণী ও উদ্ভিদের সমাহার এখানে থাকলেও এখানকার প্রধান আকর্ষণ 'চশমা বাদর'। ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকায় আমরা দেখাও পেয়ে গেলাম তাদের। এদিকে সন্ধ্যা নেমে আসায় আমরা আর বেশীক্ষণ সেখানে কাটানোর সুযোগ পাইনি। সেখান থেকে আমরা ফিরে এলাম আগরতলায়। শেষ হল আমাদের প্রথম পর্বের ভ্রমণ। *(ক্রমশ)*

'গোয়াস' মুর্শিদাবাদের এক প্রাচীন জনপদ ঃ একটি পর্যালোচনা

ফারুক আব্দুল্লাহ

প্রামাণ্য কোন নিদর্শন না থাকলে জনশ্রুতি রয়েছে যে, প্রায় পাঁচশত বছর আগে চৈতন্যদেব শ্রীপাট গোয়াসে একুশ জন পারিষদ সহযোগে এসেছিলেন এবং সেখানে কিছুদিন অতিবাহিত করে পরবর্তীতে গোমানী ও পদ্মা নদী পথে বাংলাদেশের খেতুরীতে যান। কথিত রয়েছে যে, চৈতন্যদেব ও তার পারিষদদের বসার জন্য নাকি বাইশটি পাথর স্থাপন করা হয়েছিল। এবং এরপর থেকেই শ্রীপাট গোয়াসে প্রতিবছর 'বাইশভোগ উৎসব' পালিত হতে থাকে। এছাড়া প্রতি বছর চৈত্র মাসে গোয়াসে দুই দিন ব্যাপী 'রামনবমী মেলা' উদ্যাপিত হত এবং এই উৎসবটি বর্তমানেও প্রতিবছর পালিত হয়। এই মেলাকে কেন্দ্র করে জনপদটিতে সেই প্রাচীনকাল থেকেই বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রচুর মানুষদের আগমন ঘটতো। এলাকার প্রবীণ ব্যক্তি বীরেন্দ্রনাথ সাহা'র মতে নবাবী আমলে 'রামনবমী উৎসব' এ বাংলার নবাব এবং তাদের উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং বহু রাজা ও জমিদাররা আমন্ত্রিত হতেন, এই মেলা উপলক্ষে লক্ষ্মৌ থেকে বাঈজী নিয়ে আসা হতো বলে জানা যায়।

গোয়াস জনপদটিতে 'বোরাখুলীর মা ঠাকুরন' নামে একটি প্রবাদ প্রচলিত রয়েছে। এই মা ঠাকুরন নাকি ষোলো বেহারার পালকী চড়ে শিষ্যদের বাড়ী যেতেন কিন্তু কখনো তার মুখ দেখা যেতনা কারণ তিনি সর্বদা তার মুখ ঘোমটা দিয়ে ঢেকে রাখতেন। অথচ তার গলার আওয়াজ ছিল ভীষণ জোরালো, তিনি জোর গলায় সবাইকে আদেশ করতেন ও পরামর্শ দিতেন বলে কথিত রয়েছে।

একটা সময় গোয়াস জনপদটি নানান কারণে ধীরে ধীরে সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে থাকে। পরবর্তী সময়ে বিশেষ করে মুঘল আমলে সম্রাট আকবরের সময়ে গোয়াস ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল নিয়ে গড়ে ওঠে 'গোয়াস পরগণা'। কিন্তু এর পূর্বেও বিশেষ করে সুলতানি আমলে ও শেরশাহের আমলেও জনপদটি গুরুত্বপূর্ণ হিসেবেই পরিচিত ছিল, কিন্তু এর পূর্বেও বিশেষ করে সুলতানি আমলে ও শেরশাহের সময় থেকেই জনপদটি পরগণা হিসেবে ঘোষিত হয়। বর্তমানে গোয়াস ইসলামপুর থানার অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র গ্রাম রূপে পরিচিত হলেও গোয়াস পরগণার বিস্তৃতি ছিল বহু দূর পর্যন্ত। বর্তমান ইসলামপুর, রাণীনগর, ডোমকল ও জলঙ্গী থানা এলাকা অর্থাৎ গোটা ডোমকল মহকুমা জুড়েই গোয়াস পরগণা বিরাজমান ছিল। পরগণা হিসেবে পরিচিত হওয়ার পর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলে জনপদটিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় ফলে জনপদের মূল কেন্দ্রটি শহর বা কসবায় পরিণত হয়।

এছাড়াও এই গোয়াস জনপদটির সমৃদ্ধির অপর একটি কারণ ছিল সতেরো শতকে গড়ে ওঠা ভগবানগোলা বন্দরের অতি নৈকট্য। নবাব আলীবর্দি খাঁনের আমলে এই বন্দর ছিল এলাকার অন্যতম শস্য বাজার। এই বন্দরের মাধ্যমেই বছরে প্রায় ১৮,০০০,০০০ মণের বেশি শস্য কেনাবেচা হত। ভগবানগোলা বন্দরের সাথে ভৈরব, গোমানী ও শিয়ালমারী নদীপথে গোয়াস পরগণার উন্নত

এরপর ৪ পৃষ্ঠায় ▶

নতুন গ্রামের লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির ঃ স্থাপত্য, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির নানা কথা, নানা দিক

শুভম মুখোপাধ্যায়

(৩)

লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরের সম্মুখেই গোস্বামী পরিবারের নির্মিত প্রাচীন শিব মন্দির দেখা যায়। উচ্চ ভিত্তিবেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত এই মন্দিরটি রেখ দেউল রীতির। মন্দিরটি অলংকৃত। পঞ্চরথ আকৃতি বিশিষ্ট দেউলে গাত্রে আছে বিভিন্ন মূর্তির সারি, অনেকটা প্রাচীন মন্দিরে থাকা টেরাকোটার মৃত্যুলতার মত। বিষয়গুলি অভিনব— খোল-করতাল প্রভৃতি নিয়ে নাম সংকীর্তনের দল, বিভিন্ন পশুর সারি, আবার পশুর উপর চড়া মানুষ, যোগাসনের বিভিন্ন মুদ্রা। একটি মিথুন

পলস্তারা নেই। ইটগুলির আকারে প্রাচীনতর ছাপ সুস্পষ্ট। মন্দিরের চূড়ায় আমলক, কলস প্রভৃতি অংশও দেখা যায়। মনে হয় মন্দিরটি লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরের সমসাময়িক। দুটি মন্দিরের ভিত্তিবেদীর গঠনও একরূপ। যদিও মন্দিরটির অবস্থা বেশ রুগ্ন। আশু বিজ্ঞান ভিত্তিক সংস্কার না হলে ধ্বংসের উপক্রম সমাগত। এছাড়াও নতুনগ্রামে প্রবেশ পথেই গোস্বামী পরিবারের প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন পঞ্চরত্ন শৈলীর একটি শিব মন্দির ছিল। টেরাকোটা সমৃদ্ধ এই মন্দির কিছু বছর আগে অবৈজ্ঞানিক সংস্কারের ফলে তার প্রাচীনতা ও কাঠামো সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে আধুনিক মন্দিরে পরিণত হয়েছে। কিন্তু একটি ছোট্টো গ্রামে একই পরিবারের চালা, রত্ন ও দেউল —এই তিনরীতির মন্দির নির্মাণ তাঁদের ধর্মীয় সংস্কার, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তির ইঙ্গিত দিয়ে যায়।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি রহস্যের বিষয় উত্থাপন করি। বিষয়টি লক্ষ্মীনারায়ণ জীউর রথের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। রথটি একটি প্রাচীন ধাতব রথ। প্রায় আড়াই ফুট উচ্চতার রথটি একরত্ন রীতির মন্দিরের ন্যায়। চারদিকেই ত্রিখিলান দ্বারের মত আছে। চূড়ায় আছে লক্ষ্মীনারায়ণের বসার ব্যবস্থা। রথের চারটি কোণায় উপর থেকে নিচে মূর্তিও দেখা যায়। বৈষ্ণবীয় সংস্কৃতিতে এ ধরনের মিথুন মূর্তি খুব একটা মানানসই নয়। যাই হোক, কিন্তু রহস্যের ব্যাপারে এই যে, রথটির আয়তনের থেকে মন্দিরের প্রবেশ দ্বারের আয়তন অনেক ছোট, অর্ধাংশও বলা যায়। তাই রথটিকে বাইরে আনা যায় না। হয়েছে, এটাও বলা যায় না। তবে সম্ভবত রথটি ঢোকাবার পরে কোন কারণে দরজাটি ছোট করা হয়েছিল। যাই হোক, নির্দিষ্ট প্রমাণ ছাড়া রথের রহস্য ভেদ করা অসম্ভব। রথযাত্রার সময় লক্ষ্মীনারায়ণ জিউ এই রথের উপরেই আরোহন করেন।

(৪)

লক্ষ্মীনারায়ণ জিউ এই অঞ্চলের এক বহুমান্য দেবতা। দিনে অন্নভোগ ও রাত্রে চিঁড়ে-দুধ তাঁর নিত্যসেবা। জন্মাষ্টমী, রাধাষ্টমী, রথযাত্রা, রাস, দোল, উত্থান একদাশী প্রভৃতি তিথিতে তাঁর বিশেষ পূজার আয়োজন থাকে। গ্রামস্থ চক্রবর্তী পরিবার এই লক্ষ্মীনারায়ণ জিউ পরম্পরাগত পূজক। এঁরা দেওঘরিয়া আখ্যায় ভূষিত। দেব সেবার জন্য বহু উর্বর জমির বন্দোবস্ত আছে। পূজক ব্রাহ্মণদের বৃত্তির জন্যও জমির ব্যবস্থা আছে। ভক্তদের বিশ্বাস, অনেকেই তাঁর স্বপ্নাদেশ পেয়েছেন। আরও বিশ্বাস, তাঁর অন্ন-প্রসাদ খেয়ে এঁটো পাতাটি অকাট পুকুরে (নতুনগ্রামের একটি পুকুর। জনশ্রুতি, পুকুর কখনো কাটা হয়নি) পুঁতে দিলে দুরারোগ্য ব্যাধির নিরাময় ঘটে। শোনা যায়, একাধিক বার এই শালগ্রাম শিলা চুরি হয়ে যায়, আবার অলৌকিকভাবেই তা পাওয়া যায়। এরকমই বহু গল্প, বহু বিশ্বাস জড়িয়ে আছে লক্ষ্মীনারায়ণ জিউকে কেন্দ্র করে।

সেবাইত গোস্বামী পরিবারে প্রচলিত জনশ্রুতি অনুযায়ী, প্রতিষ্ঠাতা কাঞ্চীনাথ গোস্বামী ছিলেন ব্রহ্মচারী ব্রতাবলম্বনকারী। তাঁর অগ্রজ কাশীনাথের বংশধরেরা এই নতুনগ্রামে বসবাস করেন। বর্তমানে এই বংশের পরিবার সংখ্যা তেত্রিশ ঘর। বহু প্রাচীনকাল থেকেই এই বংশ শিক্ষা-সংস্কৃতিতে উন্নত ছিল। পূর্বে অনেক সংস্কৃত পণ্ডিত তুলোট কাগজে লেখা শ্রীমদ্ভাগবত, স্কন্দপুরাণে রেবাখণ্ডে সত্যনারায়ণ পূজাবিধি, অধ্যাত্মরামায়ণম্ ও রামচন্দ্রের স্তোত্র প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তালপাতায় লেখা পুঁথির মধ্যে বৃষোৎসর্গশ্রাদ্ধপদ্ধতি বা শান্তিহোমপদ্ধতির পুঁথি আছে। পুঁথিগুলি সবই খণ্ডিত, সাল-তারিখ না পাওয়া গেলেও আনুমানিক অষ্টাদশশতাব্দী বা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে লিখিত। তালপাতায় লেখা পুঁথিগুলি থেকে এই বংশে পৌরহিত্যের ধারাটিও অনুমান করা যায়। আধুনিক কালের সংস্কৃতচর্চার মধ্যে মদনমোহন গোস্বামী ও মাধবচন্দ্র গোস্বামীর নাম খুব উল্লেখযোগ্য। এরমধ্যে মাধবচন্দ্র গোস্বামী ১৯০৭ সালে বেনারসের চতুষ্পাঠী থেকে সংস্কৃতে 'কাব্যনিধি' ও পরবর্তীকালে 'জ্যোতির্বিনোদ' উপাধি প্রাপ্ত হয়ে এই গ্রামেই টোলের ব্যবস্থা করেছিলেন। কাশীপুরের মহারাজা জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহদেওয়ের প্রিয়পাত্র ও তৎকালীন রাজপুরোহিত রাখালচন্দ্র চক্রবর্তীর মাতুলালয় ছিল এই গোস্বামী পরিবারেই। রাখালচন্দ্র অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন ও বহুগ্রন্থাদি রচনা করেছিলেন। তন্মধ্যে পঞ্চকোট রাজ্যের ইতিহাস বিষয়ক 'পঞ্চকোট ইতিহাস' সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। বিখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী তথা ধর্মগুরু ও রামচন্দ্রপুর নেতাজি আই হসপিটালের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী অসীমানন্দ সরস্বতীর মাতুলালয়ও এই নতুনগ্রামেই।

আজ হয়ত সেই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থেকে নতুনগ্রাম অনেকটাই বিচ্যুত। সেই ইতিহাসও আজ অনেকটাই মলিন। মন্দিরের মেঝেতে আধুনিক মার্বেল বসেছে, টেরাকোটার অলংকরণে ধরেছে নোনা। কিন্তু লক্ষ্মীনারায়ণ জিউ এখনও স্বমহিমায় বিরাজিত, নতুনগ্রামের প্রাচীনত্বের অভ্রান্ত সাক্ষী হয়ে। (শেষ)

▶ ১ পৃষ্ঠার পর

বাংলা-বাঙালি- বাংলাদেশ একটি পর্যালোচনা

ইশা খান ও তার পুত্র মুসা খান মুঘল বাহিনীর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে। একইভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলে প্রতাপাদিত্য। এই ইতিহাস আমরা ছাত্রছাত্রীদের পড়াই না।

বাদশা ঔরঙ্গজেব বাংলাকে বলতেন জিন্নত-উল-বেলাদ (সুবাগুলির মধ্যে স্বর্গ) কারণ সুবা বাংলা থেকে মুঘল সম্রাট সবচেয়ে বেশি খাজনা পেতেন। তাঁর রাজত্বের শেষ দিকে বাদশা মুর্শিদকুলি খানকে সুবা বাংলার দেওয়ান নিযুক্ত করেন। বাংলার সুবাদার তখন ঔরঙ্গজেবের নাতি আজিম-উস-শান। মুর্শিদকুলি দেওয়ান হয়ে রাজধানী জাহাঙ্গীর নগরে এলেন ১৭০০ খ্রীস্টাব্দের শেষ দিকে। ১৭০৪ খ্রীস্টাব্দে মুর্শিদকুলি মাখসুদাবাদে দেওয়ানি দপ্তর স্থানান্তরিত করেন তাঁর নাম অনুসারে এই শহরের নাম হয় মুর্শিদাবাদ। পরে মুর্শিদকুলি খান বাংলার সুবাদারও নিযুক্ত হন। একই সঙ্গে দেওয়ান ও সুবাদার হওয়ায় এবং মুর্শিদাবাদে অবস্থান করায়, মুর্শিদাবাদ হয়ে উঠলো বাংলার রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কেন্দ্র। এই অবস্থা চলেছিল পলাশির যুদ্ধ পর্যন্ত।

১৭৪২ খ্রীস্টাব্দ থেকে বাংলার শুরু হয় মারাঠা বর্গীদের আক্রমণ। এই আক্রমণে বাংলার বিস্তৃত অঞ্চল ছারখার হয়ে যায়। আলিবর্দী খান বহু কষ্টে ভাস্কর পণ্ডিতকে হত্যা করে ও ওড়িষা মারাঠাদের ছেড়ে দিয়ে বাংলাকে বর্গী আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করেন। তাঁর দৌহিত্র সিরাজ পলাশির যুদ্ধে পরাজিত হলে বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হয় ও শুরু হয় ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনের। (ক্রমশ)

নীল চাষ ও নীল বিদ্রোহ ঃ বারাসাত

সৌরভ বারুই

১৭৭৭ সালে লুই বণ্ড (Luis Bonnaud) নামে একজন ফরাসী নীল চাষের আধুনিক পদ্ধতি নিয়ে প্রথম বাংলায় এলেন। লুই বণ্ড-ই ছিলেন ভারতে আধুনিক নীল চাষের প্রথম নীল ব্যবসায়ী। তিনি বারাসতের মধুমুরালি পুকুরের উত্তর-পশ্চিম দিকে নীলকুঠি স্থাপন করেন। এছাড়া বাংলার অন্যান্য অঞ্চলেও তাঁর নীল কুঠি ছিল। তিনি বাংলায় নীল চাষ করে প্রচুর ঐশ্বর্যের মালিক হন। তিনি এক বছরের মধ্যেই ৪০০ মণ নীল রপ্তানি করেছিলেন এশিয়ার ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে। নদ-নদীতে পরিপূর্ণ নীল চাষের উপযুক্ত জায়গা, এছাড়া বারাসাতের উর্বর জমি দেখে নীল ব্যবসায়ীরা ২৪ পরগনার সহ নীল চাষের কেন্দ্রস্থল হিসেবে বারাসাতকেই বেছে নিয়েছিলেন। লঙ সাহেবের বিবরণ থেকে জানা যায়, "...In those days, as the civilians used to go to Baraset for change of are, ...The Governor of Calcutta occasionally used to spend a few days at Baraset"। এছাড়াও বারাসাত যেহেতু কলকাতার সবচেয়ে কাছে অবস্থিত তাই ব্যবসা বাণিজ্যে

সে সময়ে অনেক ওলন্দাজ-রা নীল চাষ করত। বারাসাতের পশ্চিমাংশে (অধুনা কলপুকুর) ছিল তাদের আস্তানা। এদিকে ধীরে ধীরে বাড়তে থাকল ইংল্যাণ্ডের বস্ত্র বাণিজ্য।

ইংরেজদের মধ্যে ক্যারেল ব্লুম নামে এক ব্যক্তি ১৭৭৮ সালে প্রথম বাংলায় নীল কুঠি স্থাপন করেন। তারপর ১৭৭৯ সালে আসেন জন প্রিন্সেপ। বারাসাতের কাছে লাবণ্যবতী বিধৌত অঞ্চলে ৭৫ বিঘা জমি নিয়ে নীল চাষ শুরু করলে গড়ে ওঠে Bengal Indigo Concern। এরপর সেখানেই স্থাপিত ২৪ পরগনার প্রথম নীল তৈরির কারখানা। নদিয়া ও চব্বিশ পরগনার নীলকর সাহেবদের নীল চাষের কেন্দ্রস্থল ছিল বারাসাত। তাঁরা বারাসাত থেকেই ২৪ পরগনা ও নদিয়া জেলার নীল চাষ দেখাশুনা করত। সেকালে বারাসাত আয়তনে বর্তমান বারাসাতের তুলনায় বড় ছিল, স্থানীয় ঐতিহাসিকদের মতে ওই সময় যশোহর ও নদিয়া জেলার অধিকাংশই ছিল বারাসাতের অন্তর্ভুক্ত। বারাসাত ছিল যাতায়াতের সুবিধা ছিল।

বাংলার অপর এক নীল ব্যবসায়ী এন.পি. কনস্টাড বারাসাতেই তাঁর নীল কারখানা স্থাপন করেন। বাংলার অধিকাংশ নীলকর সাহেবরা বারাসাতে তাদের কাছারি বাড়ি নির্মাণ করেছিলেন। বারাসাতে নীল চাষের প্রতিপত্তি এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে, সেকালে বারাসাত "Blue District" নামে পরিচিত লাভ করেছিল। ১৮১৫ সালে Robert T. Larmour এবং James Forlong নামে Bengal Indigo Company-র দুই ম্যানেজার লক্ষ লক্ষ নীল চাষীদের কর্তা হয়ে ওঠেন। শোনা যায় T. Larmour খুব অত্যাচারী ছিলেন। নীলকর সাহেবরা তাদের সুবিধার জন্য কিছু রাস্তা নির্মাণ করেছিলেন। শোনা যায় বারাসাতের পুরাতন দাতব্য চিকিৎসালয় এবং হাসপাতালটি নীলকর সাহেবদের তৈরি। ১৮৫৪ সালে নীলকর সাহেবরা হাটখোলা ডিসপেনসি নামের বারাসাতের প্রথম দাতব্য চিকিৎসালয়টি নির্মাণ করেন।

নীল চাষীদের উপর অত্যাচার শুরু হয় নীল চাষ শুরু হওয়ার কিছু দিনের মধ্যেই। সেকালে বাংলাদেশে এক বিঘার মাপ ছিল ১৪,০০০ বর্গ ফুট। কিন্তু নীলকররা ওই মাপ মেনে চলত না, তাদের মাপ ছিল ২১, ৫১১ বর্গ ফুট। ফলে নীল চাষে ক্ষতিগ্রস্ত হতেন নীল চাষীরা। চাষের জমিতে নীল চাষ করলে, সেই জমিগুলিতে ধানের ফলন ভাল হয় না। উর্বর জমির বিরাট ক্ষতি হয়। তার উপর প্রতি মণ মাত্র ৪-৫ টাকায় চাষীদের লোকসান ছাড়া লাভ হত না। ফলে নীল চাষীরা কিছু দিনের মধ্যেই নীল চাষ করতে অস্বীকার করে। নীলকর সাহেবরা দাদন দিতে চাইলেও চাষীরা নিতে চাইত না। অনেক সময় নিয়ে ফেলে ফেরত দিতে গেলে তাদের বন্দী করে রাখা হত। ওই সময় ''সমাচার দর্পণ'' -এর একটা প্রতিবেদনে দেখা যায়, ''যে প্রজা নীলের দাদন না লয় তাহাদিগের প্রতি ক্রোধ করিয়া থাকেন ও খালাসীদিগকে কহিয়া রাখেন যে ঐ সকল প্রজার গরু নীলের নিকট আইলে সে গরু ধরিয়া কুঠিতে আনিবা"। এই উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায় তাঁরা চাষীদের গরুদেরও আটকে রাখতেন। ১৮১০ সালে গর্ভনর জেনারেল লর্ড মিন্টো মন্তব্য করেছিলেন যে, ''নীলকর সাহেবরা কৃষকদের জবরদস্তি আগাম দিয়ে নীল করতে বাধ্য করাটা তাদের অভ্যাসে পরিণত করে নিয়েছে''। দেলাতুর ১৮৪৮ সালে ফরিদপুরের ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তিনি নীল কমিশনের সাক্ষ্যে বলেছিলেন, ''এমন এক বাক্স নীল ইংল্যাণ্ডে পৌঁছায় না যেটা মানুষের রক্তে রঞ্জিত নয়। ...আমি কয়েকজন রায়তকে দেখেছি যাদের দেহ বল্লম দিয়ে এপিঠ-ওপিঠ ভেদ করে দেওয়া হয়েছিল। ...কয়েকজন রায়তকে দেখেছি যাদের নীলকর ফোর্ড গুলি করে মেরেছিল''। ১৮৫০ সালে ''তত্ত্ববোধিনী" পত্রিকায় অক্ষয় কুমার লিখেছিলেন, ''নীলকরদিগের কার্যের বিবরণ করিতে হইলে প্রজা পীড়নেরই বিবরণ লিখিতে হয়। ...লোকের কত ক্লেশ, কত আশাভঙ্গ, কতদিন অনশন, কত যন্ত্রণা তাহা ক্রমে ক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে''। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের তরফ থেকে লেয়ার্ড বলেছিলেন, ''নীলকররা অসহায় কৃষকদের জমি দখল করেছে, তাঁরা সশস্ত্র হয়ে বাড়িতে প্রবেশ করেছে, তাঁরা বাড়ি ধ্বংস করেছে, গাছ কেটে ফেলেছে - যারা প্রতিবাদ করতে এসেছে তাদের হত্যা করেছে"। নীল কমিশনের সাক্ষ্যদান কালে বারাসাতের ম্যাজিস্ট্রেট এসলী ইডেন সরকারি নথিপত্র ঘেঁটে ১৮৩০ থেকে ১৮৫৯ পর্যন্ত খুন, ডাকাতি, দাঙ্গা, লুট, আগুন লাগানো ও লোকহরণের ৪৯টি অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ ঘটনার একটা তালিকা তৈরি করে কমিশন পেশ করেন। *(ক্রমশ)*

▶ ২ পৃষ্ঠার পর

'গোয়াস' মুর্শিদাবাদের এক প্রাচীন জনপদ ঃ একটি পর্যালোচনা

যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু ছিল। গোয়াসের পরিচিতির আরও একটি কারণ ছিল এই জনপদের পান। গোয়াসের পান নাকি সমগ্র বাংলা এবং বাংলার বাইরে ভীষণ জনপ্রিয়ও ছিল। ফলে এই অঞ্চলে মুঘল আমলে পানের বাজার গড়ে উঠেছিল বলে জানা যায়।

পরবর্তীকালে নবাব মুর্শিদকুলি খাঁনের আমলে গোয়াস পরগণাটি ভেঙে আরও কয়েকটি পরগণার সৃষ্টি করা হয় রাজস্ব আদায়ের সুবিধার্থে।

এই জনপদের ভৈরব, গোমানী, শিয়ালমারী প্রভৃতি নদীর তীরবর্তী এলাকার প্রচুর তুঁতের চাষ হত। ১৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে ডাচরা এবং আরও পরে ১৬৫১ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজরা বাংলায় বাণিজ্যের অনুমতি লাভ করে। ডাচরা এই এলাকা থেকে প্রচুর কাঁচা রেশম তাদের পূর্বতন বাণিজ্যকেন্দ্র গুজরাট এবং ভারতের বাইরেও চালান দিত। ফলে গোয়াস পরগণা ধীরে ধীরে সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে থাকে। ১৭৪১ খ্রিষ্টাব্দে নবাব আলীবর্দির খাঁনের আমলে বাংলায় বর্গি বা মারাঠা আক্রমণ ঘটলে তৎকালীন বাংলা তথা পূর্ব ভারতের একটি অন্যতম বন্দর শহর কাশিমবাজার ভীষণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বর্গিদের আক্রমণের হাত থেকে বাঁচতে কাশিমবাজারের প্রচুর রেশম শিল্পী, মহাজন ও ব্যবসায়ীরা গোয়াস জনপদের অন্তর্গত ভৈরব নদীর তীরে ইসলামপুরের একটি অংশে বসতি স্থাপন করে এবং তাদের পুরানো পেশা নতুন করে শুরু করে, ফলে অঞ্চলটি রেশম শিল্প কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং রেশম শিল্পীদের বসতি অঞ্চলকে কেন্দ্র করে রেশম বস্ত্রের বাজার গড়ে উঠলে এলাকাটি 'চক' ('চক' একটি ফার্সি শব্দ যার অর্থ বাজার) নামে পরিচিত হয়।

(ক্রমশ)

প্রধান সম্পাদিকা ও প্রকাশক - সহেলী চক্রবর্তী (৮৯৪২৯২৪২৩৪), প্রশ্নচিহ্ন হইতে প্রকাশিত।
উপদেষ্টামণ্ডলী - ড. অধ্যাপক রাজর্ষী চক্রবর্ত্তী, ড. স্বপন ঠাকুর, সুবিদ আবদুল্লা, ফারুক আবদুল্লা। অক্ষর বিন্যাস - শুভ্রজ্যোতি তালুকদার (৯৭৩৪৩১৪৫৬৮)